## সংস্কৃত নাটকের ক্রমবিকাশ

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য বা দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস চির রহস্যাবৃত। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত আছে, আছে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা। তবে একথা ঠিক যে, অতি প্রাচীনকালে বৈদিক সাহিত্যেই ভারতের অনুকূল পরিবেশে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাপথ বেয়ে তা ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'অমৃতমন্থন' এবং 'ত্রিপুরদাহ', পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লিখিত 'কংসবধ' এবং 'বলিবন্ধ' প্রভৃতি নাটক আজ নামমাত্রে পর্যবসিত। উপলভ্যমান সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হল অশ্বঘোষ রচিত 'শারিপুত্রপ্রকরণ'।

### অশ্বঘোষ

প্রাক্-কালিদাস যুগের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক যশস্বী বৌদ্ধ গ্রন্থকার অশ্বঘোষ। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কুশানরাজ কণিষ্কের সমসাময়িক। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'শারিপুত্রপ্রকরণ' নামক একটি নাটক পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ায় হাতে লেখা তালপাতার পুঁথিতে নাটকটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়। পূর্বেই 'অশ্বঘোষ ও তাঁর রচনাবলী' শীর্ষক আলোচনায় অশ্বঘোষ এবং তাঁর রচিত এই নাটক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

### ভাস

কালিদাস-পূর্ব যুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথিতযশা ভাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল যাবৎ ভাসের প্রসিদ্ধি ছিল কেবল প্রখ্যাত নাট্যকাররূপে। বিদ্বৎসমাজের কাছে তাঁর একটিমাত্র নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা' বিশেষ পরিচিত ছিল। ভাসের আবির্ভাবকাল বা তাঁর রচিত অন্যান্য নাটক বিদ্বজ্জনের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত তেরখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করল। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে তা ভাস-সমস্যা নামে পরিচিত।

## ভাস-সমস্যা (Bhasa Problem)

প্রাক্ কালিদাসীয় যুগের নাট্যকার রূপে ভাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনায় প্রথিতযশা ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন—"প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং বহুমানঃ।" প্রখ্যাত গদ্যকাব্যকার বাণভট্টও তাঁর 'হর্ষচরিত' কাব্যের প্রারম্ভে ভাসের নাটকের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

"সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।।"

Scanned by CamScanner

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভাস কেবলমাত্র প্রখ্যাত নাট্যকার রূপে পরিচিত ছিলেন। আলংকারিকদের কাছে তাঁর 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকই কেবল প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ভাসের অন্যান্য নাটকগুলি বিদ্বজ্জনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ১৯০৯ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী কেরলের অন্তর্গত মন্‌লিক্করনাথম্ নামক স্থানে তেরটি নাটকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেই নাটকগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) রামায়ণ মূলক নাটক—প্রতিমা ও অভিষেক নাটক।

(২) মহাভারত মূলক নাটক—দূতবাক্য, কর্ণভার, দূতঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, উরুভঙ্গ, বালচরিত।

(৩) বৃহৎকথা মূলক নাটক—স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ।

(৪) কথামূলক নাটক—অবিমারক, চারুদত্ত।

এই তেরখানি নাটকের আবিষ্কার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই নাটকগুলির রচয়িতা কে, কবেই বা তাঁর আবির্ভাবকাল, নাটকগুলি একই নাট্যকারের লেখনী-প্রসূত কিনা—প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই নাটকগুলিকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত সমস্যাই ভাস-সমস্যা নামে প্রসিদ্ধ।

নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে একদল পণ্ডিত এই নাটকগুলিকে ভাস নাটকচক্রের গৌরবময় নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেছেন। অপরপক্ষ সব ক'টি নাটককে ভাসের রচনা বলে স্বীকার করতে রাজি নন। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী আবিষ্কৃত নাটকগুলি পর্যালোচনা করে এগুলিকে ভাসের রচনা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অধ্যাপক কীথ, টমাস, পরাঞ্জপে, দেবধর প্রভৃতিও এই মতের সমর্থক। অপরদিকে বার্ণেট, জনস্টন, পিসারোতি প্রভৃতি বিদগ্ধ সমালোচকের মতে রচনাগুলি ভাসের নয়। গণপতি শাস্ত্রী যে সকল যুক্তি ও আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যকে নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূলে উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(১) আবিষ্কৃত তেরখানি নাটকের কোনটিতেই নাট্যকারের নাম উল্লিখিত হয় নি।

(২) কোন নাটকের প্রথমে নান্দীশ্লোক নেই। অথচ প্রতিটি নাটকের প্রথমে এরূপ নাট্যনির্দেশ আছে—"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।" এর থেকে অনুমিত হয় যে, রঙ্গগৃহে নান্দী অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মঞ্চে সূত্রধারের প্রবেশ সূচিত হয়েছে।

(৩) একাধিক নাটকে মুদ্রালংকারের দ্বারা নাটকীয় পাত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, পঞ্চরাত্র, উরুভঙ্গ, প্রতিমা নাটকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৪) "রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ"—প্রায় এই জাতীয় ভরতবাক্য প্রায় প্রতিটি নাটকে পরিলক্ষিত হয়।

Scanned by CamScanner

(৫) চিরাচরিত 'প্রস্তাবনা' শব্দের পরিবর্তে নাটকগুলিতে প্রস্তাবনার সমার্থক পারিভাষিক 'স্থাপনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

(৬) অধিকাংশ নাটকে অপাণিনীয় শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

(৭) একাধিক নাটকে নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করে রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ, মৃত্যু প্রভৃতি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে।

(৮) সব কয়টি নাটকে প্রায় একই জাতীয় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

(৯) নাটকগুলির মধ্যে ভাবগত, কল্পনাগত, বর্ণনাগত, শ্লোকগত বা শ্লোকাংশগত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যেমন—

(ক) "কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশঙ্কিতং মে"—এই শ্লোকাংশটি অভিষেক ও স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে পাওয়া যায়।

(খ) "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা।।"—এই শ্লোকটি বালচরিত এবং চারুদত্ত নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) "এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে! কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে"—এই বাক্যটি স্বপ্নবাসবদত্ত, পঞ্চরাত্র, দূতঘটোৎকচ, বালচরিত, মধ্যমব্যায়োগ, কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ এবং অভিষেক নাটকে পাওয়া যায়।

(ঘ) "ধর্মস্নেহান্তরেন্যস্তা"—এই শ্লোকাংশটি স্বপ্নবাসবদত্ত ও অভিষেক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়।

(ঙ) বালচরিত এবং পঞ্চরাত্র নাটকে একই গ্রাম্যচিত্র কল্পিত হয়েছে।

(চ) বালচরিত, অভিষেক, দূতবাক্য প্রভৃতি নাটকে মহাবীরগণকে মন্দার পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(ছ) একাধিক নাটকে নায়ক-নায়িকার মিলনকে চন্দ্রের সঙ্গে বিশাখা অথবা রোহিণী নক্ষত্রের মিলন-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরি-উক্ত প্রমাণ সমূহের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, সম্পূর্ণ নাটকচক্র একজন কবিরই রচনা। কিন্তু কে সেই কবি? এই প্রশ্ন বা সমস্যা সমাধানের জন্য আলংকারিক রাজশেখরের একটি শ্লোক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূক্তিমুক্তাবলীতে রাজশেখরের সেই শ্লোকটি হল—

"ভাসনাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ।।"

এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, ভাস একটি নাটকচক্র রচনা করেছিলেন, সেই

Scanned by CamScanner

নাটকচক্রের মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকই ছিল শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর দ্বারা আবিষ্কৃত নাটকগুলির মধ্যেও স্বপ্নবাসবদত্ত নামক নাটক ছিল এবং এই নাটকের সঙ্গে অন্যান্য নাটকগুলির রচনারীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সব কয়টি নাটকই নাট্যকার ভাসের রচনা। আবার কবি বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকার "সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকে ভাসের নাটকের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা এই নাটকগুলিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অর্থাৎ সমস্ত নাটক সূত্রধারের বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে, নাটকগুলিতে বহু ভূমিকার সমাবেশ আছে, পতাকার উপস্থিতি নাটকগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আরও একটি সাদৃশ্য নাটকগুলির মধ্যে লক্ষণীয়। নাট্যগতির দ্রুততা সম্পাদনের জন্য নাট্যকার "প্রবিশ্য', ও "নিষ্ক্রম্য" শব্দ ব্যবহার করে ঘনঘন মঞ্চে পাত্রপাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থান সূচিত করেছেন। গঠনগত এবং আভ্যন্তরীণ এই সকল সাদৃশ্য একথাই প্রমাণ করে যে, সম্পূর্ণ নাটকচক্রটি নাট্যকার ভাস কর্তৃক রচিত।

অপরদিকে বার্নেট, জনস্টন, পিসারোতি প্রভৃতি পণ্ডিত এই নাটকগুলিকে ভাসের রচনা বলে মানতে রাজী নন। তাঁদের যুক্তি হল—(১) এই নাটকগুলি সম্ভবতঃ কেরল অঞ্চলের ভ্রাম্যমান চক্কিয়ার নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক রচিত। (২) আবার এমনও হতে পারে—বিভিন্ন নাট্যকারের নাটক এই ভ্রাম্যমান নাট্যগোষ্ঠী সংগ্রহ করে নিজেদের অভিনয়োপযোগী করে পরিবর্তন করে নিয়েছে। সুতরাং নাটকের অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য এই পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। (৩) 'নান্দ্যন্তে'—এই তথাকথিত প্রাচীন রীতি কেবল এই আবিষ্কৃত নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য নয়। এই রীতি শূদ্রকের 'পদ্মপ্রাভৃতক' এবং বিজ্জকার 'কৌমুদীমহোৎসব' নামক নাটকেও দেখা যায়। (৪) স্বপ্নবাসবদত্তের যে সকল উদ্ধৃতি অন্যত্র পাওয়া যায়, অধুনাপ্রাপ্ত স্বপ্নবাসবদত্তের সঙ্গে তা সর্বাংশে এক নয়। (৫) বাণভট্টের "সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ভাসের নাট্যরীতির সংকেত আছে একথা সঙ্গত নয়। এখানে ভাসের নাটককে দেবমন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মাত্র।

ভিন্তারনিৎস, সুকথঙ্কর প্রভৃতি পণ্ডিত এবিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে যতদিন পর্যন্ত অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত ভাসকেই এই নাটকচক্রের রচয়িতা রূপে স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বিরোধীরা তাঁদের মতকে আরো যুক্তিদ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত গণপতি শাস্ত্রীর মতই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। উপসংহারে এস. কে. দে মহোদয়ের মত উদ্ধৃত করে একথা বলাই সমীচীন যে—"The thirteen Trivandrum plays reveal undoubted similarities, not only verbal and structural, but also stylistic and ideological which might suggest unity of authorship."[১]

---

১. Dasgupta & De : HSL, P–107

Scanned by CamScanner

# ভাসের নাটকাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

**প্রতিমা ঃ** ভাসের রামায়ণ কথামূলক নাটকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হল প্রতিমা নাটক। রামের বনবাস থেকে আরম্ভ করে রাবণ বধের পর পুষ্পক বিমানে সীতার সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিমাগৃহের কল্পনা ভাসের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রতিমাগৃহে রক্ষিত দশরথের মূর্তি দেখে ভরত পিতার মৃত্যুর কথা জানতে পারেন। কারণ এখানে সূর্যবংশের মৃত রাজাদেরই মূর্তি কেবল রাখা হয়। নাটকটি সাত অঙ্কে নিবদ্ধ।

**অভিষেক ঃ** রামায়ণ মূলক 'অভিষেক' ছয় অঙ্কের নাটক। রামচন্দ্রের দ্বারা বালিবধ ও কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে সুগ্রীবের অভিষেকের মাধ্যমে নাটকটির সূত্রপাত। অবশেষে রাবণবধের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা, অযোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্রের অভিষেকে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। রামচন্দ্র ও সুগ্রীব—উভয়ের অভিষেক এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলে নাটকটির অভিষেক নামকরণ যথার্থ।

**দূতবাক্য ঃ** দূতবাক্য একাঙ্ক নাটক। নাটকের কাহিনী মহাভারত থেকে আহৃত। পাণ্ডবদের দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজ দুর্যোধনের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবদের জন্য রাজ্যের অর্ধাংশ দাবী করেন। দুর্যোধন স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে, বিনা যুদ্ধে তিনি সূচ্যগ্র ভূমিও পাণ্ডবদের দেবেন না। শুধু তাই নয়, দূতরূপে আগত শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বন্দী করতে আদেশ দেন। দুর্যোধনের ধৃষ্টতায় শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়।

**কর্ণভার ঃ** মহাভারত কথামূলক এই নাটকটিও একাঙ্ক। অর্জুনের বিরুদ্ধে কর্ণের যুদ্ধযাত্রাকালে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষার প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। দানবীর কর্ণ প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণের জন্য বিভিন্ন রত্ন, রত্নমণ্ডিত বহুসংখ্যক অশ্ব, সবৎস গাভী, হস্তী, এমন কি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল দান করতে চাইলেন। এসবের কোনটাই প্রার্থীর কাম্য নয়। তিনি কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডল প্রার্থনা করলেন। সারথি শল্যের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি নিজের অভেদ্য কবচকুণ্ডল তুলে দিলেন ছদ্মবেশী ইন্দ্রের হাতে। বিনিময়ে দেবদূতের মাধ্যমে ইন্দ্র কর্ণকে দিলেন বিমলা নামক একাঘ্নী অস্ত্র।

**দূতঘটোৎকচ ঃ** সপ্তরথী মিলে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করার পর পুত্রশোকাতুর অর্জুন প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হলেন। এদিকে কৃষ্ণের কথামত কৌরবসভায় শান্তির প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন ঘটোৎকচ। দুর্যোধন তাঁকে অপমানিত করলেন। অবশেষে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কথায় শান্ত হলেন।

**মধ্যমব্যায়োগ ঃ** মাতা হিড়িম্বার উপবাস পারণের জন্য পুত্র ঘটোৎকচ এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র হিড়িম্বার খাদ্যরূপে যেতে সম্মত হয়। তার অনর্থক বিলম্ব দেখে ঘটোৎকচ 'মধ্যম, মধ্যম' বলে ডাকতে শুরু করে। মধ্যম পাণ্ডব

Scanned by CamScanner

ভীম সেই ডাক শুনে ঘটোৎকচের নিকট উপস্থিত হন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে ব্রাহ্মণপুত্রের পরিবর্তে নিজেকে হিড়িম্বার ভোজ্যরূপে উৎসর্গ করতে চান। ভীমের প্রস্তাবে ঘটোৎকচ সম্মত না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। অবশেষে স্বেচ্ছায় ভীম ঘটোৎকচের সঙ্গে যান এবং স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে মিলিত হন। ঘটোৎকচ ভীমকে নিজের পিতা বলে জানতে পারে।

**পঞ্চরাত্র ঃ** এটি তিন অঙ্কে রচিত সমবকার জাতীয় রূপক। যজ্ঞশেষে দুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে দক্ষিণা দিতে চাইলে দ্রোণ পাণ্ডবদের জন্য রাজ্যের অর্ধাংশ প্রার্থনা করেন। কুটিলমতি শকুনি তাতে একটি শর্ত যোজনা করেন—পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ আনতে পারলে দুর্যোধন দ্রোণের অভিলাষ পূর্ণ করবেন। এদিকে সংবাদ এল যে—অমিত বলশালী কীচককে কোন এক অজ্ঞাতপরিচয় বীর বাহুবলে হত্যা করেছে। ভীষ্ম বুঝতে পারলেন যে, এই অসাধ্য সাধনকারী বীর ভীম ছাড়া আর কেউ নন। তিনি আরও নিশ্চিত হতে চান। তাই তাঁর কথামত কৌরবেরা বিরাটরাজের গোধন-হরণে যুদ্ধযাত্রা করল। পাণ্ডবেরা তখন অজ্ঞাতবাসকালে ছদ্মবেশে বিরাটরাজের আশ্রয়ে ছিলেন। যুদ্ধে পাণ্ডবদের সন্ধান পাওয়া গেল। দুর্যোধন পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাণ্ডবদের রাজ্যার্ধ দান করলেন। দুর্যোধনের যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্রোণকর্তৃক দক্ষিণা প্রার্থনা, শকুনির শর্ত, রাজ্যার্ধদান প্রভৃতি অমহাভারতীয় ঘটনা এই নাটকে নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত।

**উরুভঙ্গ ঃ** মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গই এই নাটকের মূল বিষয়। এটি একাঙ্ক নাটক। নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন করে এই নাটকে ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ এবং দুর্যোধনের মৃত্যু দেখানো হয়েছে রঙ্গমঞ্চে। সংস্কৃতসাহিত্যে উরুভঙ্গই একমাত্র দুঃখাত্মক নাটক বা Tragic Drama.

**বালচরিত ঃ** শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন অবলম্বনে রচিত একাঙ্ক নাটক বালচরিতের উৎস মহাভারতের হরিবংশ। অত্যাচারী কংসের ভয়ে বর্ষণমুখর রাত্রির ঘোর অন্ধকারে বসুদেব নবজাতক শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হয়ে তাঁকে রেখে এলেন গোপরাজ নন্দের আলয়ে। এদিকে কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতে নিধনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। তার প্রেরিত সমস্ত অনুচর বালক কৃষ্ণের হাতে নিহত হল। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস তাঁকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানাল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণই কংসকে বধ করেন।

**প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ঃ** এটি চার অঙ্কের নাটক। এর কাহিনী বৃহৎকথা থেকে গৃহীত। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। প্রদ্যোত মহাসেন উদয়নকে বন্দী করে তাঁর কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীতশিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কৌশলে প্রভু উদয়নকে মুক্ত করেন। পরস্পর প্রণয়াসক্ত উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয় পরিণয়ে সার্থকতা লাভ করে।

**স্বপ্নবাসবদত্ত ঃ** বৃহৎকথায় বর্ণিত উদয়ন-কাহিনীর শেষাংশ অবলম্বনে ছয় অঙ্কে নাটকটি রচিত। উদয়নের রাজ্য শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্ মন্ত্রী

Scanned by CamScanner

যৌগন্ধরায়ণ স্থির করেন যে, শত্রুদমনের জন্য মগধরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন আবশ্যক এবং তা সম্ভব উদয়নের সঙ্গে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহের মাধ্যমে। কিন্তু বাসবদত্তার সহায়তা ভিন্ন এই অসাধ্য সাধন অসম্ভব। যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করে আবন্তিকার ছদ্মবেশে তাঁকে পদ্মাবতীর কাছে ন্যস্ত রাখেন। এদিকে পদ্মাবতী ও উদয়নের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। অবশেষে বাসবদত্তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

**অবিমারক ঃ** প্রচলিত লোককথা অবলম্বনে রচিত অবিমারক ছয় অঙ্কের নাটক। সৌবীর রাজপুত্র অবিমারক এবং রাজকন্যা কুরঙ্গীর প্রণয় এই নাটকের উপজীব্য বিষয়। অভিশপ্ত রাজপুত্র অবিমারক নীচজাতীর ন্যায় জীবনযাপন করত। রাজকন্যা কুরঙ্গীর সঙ্গে সে ছদ্মবেশে মিলিত হয়। অবশেষে নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে উভয়ের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়।

**চারুদত্ত ঃ** এটি চার অঙ্কের নাটক। দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও নটী বসন্ত-সেনার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। মদনমন্দিরের উৎসব-প্রাঙ্গণে উভয়ের সাক্ষাৎকার এবং প্রণয়ের সূচনা। কিন্তু দরিদ্র চারুদত্তের সঙ্গে বসন্তসেনার প্রণয়ের প্রধান অন্তরায় ছিল বসন্তসেনার অর্থলোলুপ জননী। দুর্বৃত্ত রাজশ্যালক শকারের প্রলোভন ও মায়ের পীড়াপীড়ি উপেক্ষা করে বসন্তসেনা চারুদত্তের কাছে যেতে উদ্যত হন। এখানে নাটকটি হঠাৎ সমাপ্ত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার মিলন না থাকায় নাটকটিকে অসমাপ্ত বলে অনুমান করা হয়। নাটকটি কবিকল্পিত হলেও বিষয়বস্তুর বিন্যাসে অনেকটা বৃহৎকথার কাছে ঋণী। ভাসনাটকচক্রের অন্তর্ভূক্ত 'চারুদত্ত' অন্যান্য নাটকগুলি থেকে স্বতন্ত্র ও অভিনব বৈশিষ্ট্যে বিলক্ষণ। অধ্যাপক সি. আর. দেবধরের মতে "The Cārudatta is possibly the only play that stands out from this group and has peculiarities which are not shared by the rest of the plays." (Plays ascribed a Bhāsa–their authenticity & merits, p-19).

## ভাসের নাট্যপ্রতিভা

নাট্যকাররূপে ভাসের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। রামায়ণ, মহাভারত বা প্রাচীন লোককথা থেকে নাটকের কাহিনী আহরণ করে কল্পনার রঙে ও প্রতিভাস্পর্শে সেই পুরাতন কাহিনীকে তিনি অভিনব করে তুলেছেন। কল্পিত বৃত্তান্তের সংযোজন ভাসের নাটকগুলিকে নাট্যকলার উৎকর্ষে মণ্ডিত করেছে। ঘটনার সংঘাত বা দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণস্বরূপ। এই নাট্যদ্বন্দ্ব নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টির মূল যা ভাসের নাটকগুলিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কাহিনী বিন্যাসের ন্যায় সংলাপ রচনাতেও ভাস ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সংলাপগুলি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর, অযথা দীর্ঘায়িত নয়। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই এমন প্রাঞ্জল যে মনে হয়, ভাস যেন তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কথ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা কুশীলবের মুখে সংলাপ রূপে বসিয়ে দিয়েছেন। এভাবে নাটকের ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত

Scanned by CamScanner

হওয়ায় হয়ে উঠেছে বাস্তবোচিত ও হৃদয়গ্রাহী। সমালোচক A. D. Pusalker-এর মতে—'The language is very simple, natural and touching, alternated with simple figures of speech like simile and metaphor." (Bhāsa—A study, p-94).

অভিনয়ের উপযোগী ঘটনার গতিবেগ ভাসের নাটকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঘটনার দ্রুততা সম্পাদনের জন্যই নাট্যকার কোন নাটকীয় পাত্রপাত্রীর মুখে যেমন অযথা দীর্ঘ সংলাপ আরোপ করেন নি, তেমনি কোন নাটকীয় পাত্রপাত্রীকে অধিকক্ষণ মঞ্চে আবদ্ধ রেখে দর্শকের বিরক্তি উদ্রেক করেন নি। কালিদাস বা ভবভূতির নাটকের মত ভাসের নাটকগুলিতে কাব্যগুণের উৎকর্ষ হয়তো নেই, তবুও নাটকীয়তার দিক থেকে সেগুলি উচ্চ প্রশংসিত। ভিন্তারনিৎসের মতে ভাস-রচিত নাটকগুলি—"are all very dramatic, full of life and action."

চরিত্রচিত্রণেও ভাসের প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। মুখ্য চরিত্রের পাশাপাশি গৌণ চরিত্রগুলিও নাট্যকারের প্রতিভার দীপ্তিতে যেন ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সামান্য উক্তি-প্রত্যুক্তিতেই চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে জর্জরিত বাসবদত্তার আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য, প্রতিমা নাটকে পিতার মৃত্যু সংবাদ জানার পর ভরতের হৃদয়বেদনা, পঞ্চরাত্রে শকুনির কুটিলতা, স্বপ্ননাটকে যৌগন্ধরায়ণের নীতি-বিচক্ষণতা, উরুভঙ্গে দুর্যোধনের অনুতাপ, কর্ণভার নাটকে দেবতার ছলনার কাছে দানশীল কর্ণের দানের মাহাত্ম্য আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলি পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও চরিত্রচিত্রণের গৌরবে অবিস্মরণীয়। পরস্পর বিপরীতধর্মী চরিত্রের সমাবেশের দ্বারা তিনি একটি চরিত্রের মহত্ত্বকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দূতবাক্য' নাটকে দুর্যোধনের নীচতার কাছে শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতা স্পষ্ট। 'কর্ণভার' নাটকে দেবরাজ ইন্দ্র ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে সামান্য মানবে রূপান্তরিত হয়েছেন, কিন্তু দানের গৌরবে মানুষ কর্ণ উন্নীত হয়েছেন দেবতার স্তরে। রসপরিবেশনেও ভাসের কুশলতা লক্ষণীয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত প্রভৃতি রসের সার্থক সংযোজনে ভাস যথার্থ সার্থক। বিদূষকের বাচনভঙ্গী ভাসের পরিহাস কুশলতার স্বাক্ষরবাহী। অলংকার প্রয়োগেও ভাসের পরিপাটী লক্ষণীয়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অনুমান, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অলংকারের বহুল অথচ সাবলীল প্রয়োগ নাটকগুলিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। কাহিনী উপস্থাপনার কৌশলে, সংলাপের সহজ সরল ভঙ্গীতে, নাট্যকলার দক্ষতায়, চরিত্রচিত্রণের সার্থকতায়, রসপরিবেশনের কুশলতায়, ছন্দের সুষমায় এবং অলংকার প্রয়োগের পরিমিতিতে ভাসের নাটকগুলি হয়ে উঠেছে অনবদ্য ও উৎকৃষ্ট। কালিদাস-পূর্ব যুগের নাট্যকার রূপে ভাস যথার্থ প্রথিতযশা।

## কালিদাসের নাটকত্রয়

**কালিদাস** মূলতঃ কবি হলেও নাট্যসাহিত্যে সমান দক্ষতায় তাঁর পদসঞ্চার সকলকে বিস্মিত করে। মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল—তিনটি নাটকেই

Scanned by CamScanner

কবিপ্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের প্রেমভাবনার ক্রমপরিণতির স্তর এবং নাট্যপ্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখে মনে হয় যে, মহাকবি কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার বীজ মালবিকাগ্নিমিত্রে উপ্ত হয়েছে, বিক্রমোর্বশীয়ে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলে পল্লবিত হয়ে পরিণত হয়েছে পুষ্পপত্র-সমৃদ্ধ বিশাল মহীরূহে।

মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের প্রথম বয়সের রচনা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে এটাই কালিদাসের প্রথম নাট্যকৃতি। প্রথম রচনার বিনম্র বিনয়[১] সেই ইঙ্গিতই বহন করে। বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকার প্রণয় ও পরিণয় এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের মূল বিষয়বস্তু। বিদর্ভের রাজকন্যা মালবিকা দস্যুহস্তে পড়ে ঘটনাচক্রে অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরে রাজমহিষী ধারিণীর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন। ধারিণী তাঁর নৃত্য ও ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি তাকে রাজা অগ্নিমিত্রের চোখের আড়ালে রাখতে চাইলেও রাজা মহিষীর পাশে চিত্রিতা সুন্দরী মালবিকাকে দেখে মুগ্ধ হন। বিদূষক গৌতমের সহায়তায় মালবিকার নৃত্যকলা দেখে রাজা তার প্রতি আসক্ত হন। অগ্নিমিত্র ও মালবিকার গোপন প্রণয়ের দৃশ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে দ্বিতীয়া রাণী ইরাবতী রাজাকে তিরস্কার করেন এবং বিদূষক ও মালবিকাকে বন্দী করেন। বিদর্ভ থেকে আগত দূত প্রভূত উপঢৌকন এবং শিল্পকলায় নিপুণা পরিচারিকা সহ রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী। তারা মালবিকাকে তাদের রাজকুমারী বলে চিনতে পারে। মালবিকার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর সংবাদ আসে যে অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরে এসেছেন। এই আনন্দের মুহূর্তে দেবী ধারিণী মালবিকাকে বধূরূপে অগ্নিমিত্রের হাতে সমর্পণ করেন। নায়ক-নায়িকার মধুর মিলনে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে।

নাটকটি ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে ভিত্তি করে রচিত। শুঙ্গবংশের তিন রাজা—পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্র এবং অগ্নিমিত্রের অমাত্য বাহতক, রাজশ্যালক বীরসেন, বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন ও তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা মাধবসেন—এই কয়টি ঐতিহাসিক চরিত্র ছাড়া সম্পূর্ণ কাহিনী কবিকল্পিত। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' দ্রুতলয়ে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের এক জীবন্ত চিত্র, যা রঙে, রসে ও বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত। নাটকটিতে রাজপ্রাসাদের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে, প্রতিফলিত হয়েছে রাজান্তঃপুরের আভ্যন্তরীণ রঙ্গরসের নিখুঁত ছবি। লাবণ্যময়ী নায়িকা মালবিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা, প্রেমিক প্রেমিকার হাব-ভাব-বিলাস, আবেগচঞ্চল প্রণয়চিত্র কতই না বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী! চরিত্রচিত্রণেও কবির দক্ষতা প্রশংসনীয়। অগ্নিমিত্র বা মালবিকা নায়ক বা নায়িকা হিসাবে খুব উচ্চস্তরের না হলেও নাট্যকাহিনীর উপযোগী করেই নাট্যকার তাঁদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিদূষকের কৌতুকপ্রিয়তা ও ভোজনরসিকতা, ধারিণীর রাজমহিষীসুলভ আত্মমর্যাদা, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা; ইরাবতীর প্রতিনায়িকাসুলভ প্রগল্‌ভতা ও ঈর্ষাকাতরতা প্রভৃতি নাট্যকারের প্রতিভাস্পর্শে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। পুরাতন বলেই কবিকর্ম উৎকৃষ্ট হবে, আর নতুন বলেই তা

---

১. "প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং পরিষদো বহুমানঃ।—মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রস্তাবনা।

Scanned by CamScanner

নিন্দনীয় হবে এমন কোন কথা নেই—"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্" (১.২)। কবির প্রথম নাট্যকৃতি বিষয়ে তাঁর এই প্রত্যাশা সার্থক হয়েছে, নাটকটি হয়ে উঠেছে রসোত্তীর্ণ।

বিক্রমোর্বশীয় কালিদাস-রচিত ত্রোটক জাতীয় রূপক। উর্বশী-পুরূরবার প্রণয়কাহিনী এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। ঋগ্বেদ, পুরাণ ও মহাভারতে উর্বশী-পুরূরবার উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। কবি সেই পুরাতন কাহিনীকে তাঁর নাট্য প্রতিভার যাদুস্পর্শে উপভোগ্য করে তুলেছেন। কেশিদানবের দ্বারা অপহৃতা লাবণ্যনির্ঝরিণী সুরসুন্দরী উর্বশীকে প্রতিষ্ঠানপুরাধিপতি পুরূরবা উদ্ধার করেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হলেন। ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশীকে চলে যেতে হল স্বর্গে। সেখানে 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয়কালে অনবধানতাবশতঃ উর্বশীর মুখ দিয়ে 'পুরুষোত্তম' নামের পরিবর্তে উচ্চারিত হল পুরূরবার নাম। ফলে নাট্যাচার্য ভরতের অভিশাপে উর্বশী স্বর্গচ্যুতা হলেন। শাপে বর হল। উর্বশী মর্ত্যে পুরূরবার বধূরূপে বাস করতে লাগলেন। তবে ইন্দ্রের শর্ত ছিল—পুরূরবা উর্বশীর গর্ভজাত সন্তানের মুখদর্শন করলেই মর্ত্যমানবের প্রণয়বন্ধন ছিন্ন করে উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে। উর্বশী ও পুরূরবা দীর্ঘকাল সুখে অতিবাহিত করলেন। ইতিমধ্যে উর্বশী তাঁর গর্ভজাত সন্তানকে গোপনে রেখে এসেছেন এক ঋষির আশ্রমে। গন্ধমাদন পর্বতে বিহারকালে একদিন পুরূরবার প্রতি ক্রোধবশতঃ অভিমানিনী উর্বশী নিষিদ্ধ কুমারবনে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হন। উর্বশীর বিরহে প্রেমোন্মত্ত রাজা প্রিয়তমার অন্বেষণে বিলাপ করতে করতে এক দৈববাণী হয়। একটি বিশেষ লতাকে আলিঙ্গন করা মাত্রই সঙ্গমনীয় মণির স্পর্শে লতাটি উর্বশীর রূপ ধারণ করে। অনাবিল প্রণয়সুখ ও স্বর্গীয় উল্লাসের মধ্যে একদিন নেমে এল চরম বিষাদ। সঙ্গমনীয় মণি অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি পাখী বাণবিদ্ধ অবস্থায় ভূপতিত হয়। বাণের ফলকে লেখা ছিল—

**"উর্বশীসম্ভবস্যায়মৈলসূনোর্ধনুষ্মতঃ।**
**কুমারস্যায়ুষো বাণঃ সংহর্তা দ্বিশদায়ুষাম্।।"**

অর্থাৎ শত্রুর আয়ুক্ষয়কারী এই বাণ উর্বশীর গর্ভজাত পুরূরবাতনয় ধনুর্ধর কুমার আয়ুর। রাজা পুত্রমুখ দর্শন করে প্রিয়তমার আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যখন ব্যাকুল, তখনই দেবর্ষি নারদ এসে ইন্দ্র-প্রেরিত বার্তা নিবেদন করলেন—'ইয়ঞ্চ উর্বশী যাবদায়ুস্তে ধর্মচারিণী ভবত্বিতি।" দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রের প্রধান সহায় পুরূরবার জয়ের পুরস্কারস্বরূপ ইন্দ্রের এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য। পুরন্দরের আনুকূল্যে পুরূরবা তাঁর প্রিয়তমার আজীবন সঙ্গলাভে কৃতার্থ হলেন।

উর্বশী-পুরূরবার বিয়োগান্ত পুরাবৃত্তকে কালিদাস তাঁর এই নাটকে মিলন-পর্যবসায়ী করে তুলেছেন। উর্বশীর প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ, সঙ্গমনীয় মণির অবতারণা প্রভৃতি ঘটনা নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত, ঋগ্বেদ-পুরাণাদিতে এই কাহিনী অনুপস্থিত। নায়ক পুরূরবাকে

Scanned by CamScanner

নাট্যকার বীররূপে, আদর্শ প্রেমিকরূপে এবং পুত্রবৎসল পিতারূপে চিত্রিত করেছেন। রাজার প্রেমের গভীরতা ছিল বলেই তাঁর জন্য স্বর্গবিহারিণী উর্বশী স্বর্গের মায়া কাটিয়ে মর্ত্যমানবের প্রেমে বাঁধা পড়েছিলেন। তবে প্রতিনায়িকা ঔশীনরীর কাছে নায়িকা হিসাবে উর্বশী যেন কিছুটা নিষ্প্রভ। চতুর্থাঙ্কে উর্বশীর বিরহে প্রেমোন্মত্ত পুরূরবার মর্মস্পর্শী বিলাপ সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অরণ্যের বৃক্ষলতা, পশু-পাখী যেন তাঁর প্রেমিক দৃষ্টিতে উর্বশীরূপে প্রতিভাত। গীতিকাব্যের চমৎকারিতায় ও হৃদয়ভাবের ঐকান্তিকতায় চতুর্থাঙ্কটি পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মালবিকাগ্নিমিত্রে কালিদাসের যে প্রেমভাবনার সূচনা, বিক্রমোর্বশীয়ে তার ক্রমিক বিকাশ, শাকুন্তলে তার মঙ্গল-মাধুর্যে উত্তরণ।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি। নাট্যকলার বৈচিত্র্যে, কাব্যশিল্পের মাধুর্য্যে, প্রেমের পবিত্রতায় কালিদাস তাঁর এই নাটকটিকে সমগ্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। তাই এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে—'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলমূ।' মহাভারতে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনীকে উপজীব্য করেই নাটকটি সাত অঙ্কে রচিত। হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত স্বচ্ছতোয়া মালিনী নদীর তীরে মহর্ষি কন্বের শান্তরসাস্পদ তপোভূমিতে এসে আশ্রমবালা শকুন্তলাকে দেখলেন। দুই প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মধ্যস্থতায় এই প্রথম দর্শনেই প্রণয়ের সূচনা হল। উদ্ভিন্নযৌবনা অপ্সরাকন্যা শকুন্তলার মধ্যেও সংক্রমিত হল অনুরাগ। কুলপতি কন্বের অনুপস্থিতিতে উভয়ে গান্ধর্ব বিধিতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। দুষ্যন্ত ফিরে গেলেন রাজধানীতে। পতিচিন্তায় নিমগ্নহৃদয়া শকুন্তলা আশ্রমের অতিথিসৎকারে অবহেলার জন্য তাঁর উপর বর্ষিত হল কোপনস্বভাব দুর্বাসার অভিশাপ—"শকুন্তলা যার চিন্তায় বিভোর, স্মরণ করিয়ে দিলেও সে শকুন্তলাকে চিনতে পারবে না।' সখীর সনির্বন্ধ অনুরোধে দুর্বাসা বললেন—কোন অভিজ্ঞান আভরণ দেখাতে পারলেই শাপের প্রভাব দূর হবে। শকুন্তলার হাতে দুষ্যন্ত-প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক আছে ভেবে সখীরা আশ্বস্ত হলেন। প্রবাস-প্রত্যাগত মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করলেন। মানব ও মানবেতর প্রকৃতিকে বিচ্ছেদের শোকে মুহ্যমান করে শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করলেন। দুর্বাসার অভিশাপে স্মৃতিভ্রষ্ট দুষ্যন্তের কাছে অভিজ্ঞান দেখাতে না পেরে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাতা হলেন শকুন্তলা। রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে নিয়ে গেলেন এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। শচীতীর্থে শকুন্তলার যে আংটি হস্তচ্যুত হয়েছিল তা ধীবরের কাছ থেকে পাওয়ার পর দুষ্যন্তের মনে পড়ল শকুন্তলার কথা। শকুন্তলাকে অকারণে প্রত্যাখ্যানের কথা ভেবে তিনি অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হলেন। অবশেষে ইন্দ্রকে যুদ্ধে সহায়তা করে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মারীচের আশ্রমে ঘটনাপরম্পরায় সপুত্র শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলন হল।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' কালিদাসের সর্বাতিশায়ী ও কালজয়ী সৃষ্টি। নায়িকা চরিত্রের ক্রমিক পরিণতি এখানে লক্ষণীয়। সরলা, লজ্জানম্রা তপোবনবালা শকুন্তলা পঞ্চমাঙ্কের

Scanned by CamScanner

প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে গভীর আত্মপ্রত্যয়ে পরিপূর্ণা, সপ্তমাঙ্কে বিরহব্রতচারিণী, আদর্শ সহধর্মিণী। কবিকল্পিত দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত নাটকটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। মর্ত্যের চঞ্চল প্রণয়কে, রূপের কামজ মোহকে অভিশাপের মাধ্যমে বিচ্ছেদের বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করে মহাকবি প্রেমকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মঙ্গলমাধুর্যে উন্নীত করেছেন। চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যে তপোবন-প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার নিবিড় অন্তরঙ্গতার চিত্র ফুটে উঠেছে। আজন্ম-পরিচিত তপোবন-প্রকৃতিকে, আবাল্যের সহচরী অভিন্নহৃদয় অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে, মাতৃহারা হরিণশিশুকে ছেড়ে যেতে শকুন্তলার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন, সখীদ্বয়ের বাঁধভাঙা অশ্রুর প্লাবন, মহর্ষি কন্বের বাষ্পস্তম্ভিত কণ্ঠে কন্যার প্রতি গৃহীসুলভ উপদেশ ও শোকাকুল দৃষ্টি সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে। করুণ রসের এই অভিব্যক্তি এই নাটকের চতুর্থাঙ্ককে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তাই বলা হয়—

**'কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।**
**তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা।।"**

পঞ্চমাঙ্কটিও কালিদাসের নাট্যকুশলতায় সমৃদ্ধ। তাই অনেকে এই অঙ্কটির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন—'পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ'। চরম নাটকীয় উৎকণ্ঠা, নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নায়িকা চরিত্রের পূর্ণতা নাটকের এই অংশটিকে নাটকীয় উৎকর্ষে মণ্ডিত করেছে। চরিত্রচিত্রণেও নাট্যকারের দক্ষতা অসামান্য। ধীরোদাত্ত দুষ্যন্ত আদর্শ রাজা ও প্রেমিক। নায়িকা শকুন্তলা প্রেমমুগ্ধা। সপ্তমাঙ্কে তিনিই আবার মাতৃত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল। ব্রহ্মতেজের প্রতিমূর্তি মহর্ষি কণ্ব আজীবন ব্রহ্মচারী হয়েও গৃহস্থদের কর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ। প্রিয়ংবদা বাক্‌চতুরা ও হাস্যপরিহাসপ্রিয়া। অনসূয়া স্বল্পভাষিণী ও দূরদর্শিণী। বিদূষকের উপস্থিতি অপেক্ষা অনুপস্থিতিই এখানে নাটকের ব্যাপ্তিতে অধিকতর সহায়ক হয়ে উঠেছে। নায়ক-নায়িকার প্রথমাঙ্কগত প্রথম মিলন সপ্তমাঙ্কে শাশ্বত মিলনে পর্যবসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্য্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গ-তপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।[১]

এই নাটকের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে বর্হিভারতেও প্রসারিত। বিভিন্ন ভাষায় এই নাটক অনুদিত হয়েছে। প্রখ্যাত জার্মান মনীষী গ্যেটে (Goethe) এই নাটক পাঠ করে বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন—

Would'st thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed,
Would'st thou the Earth and Heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala ! and all at once is said.

১. প্রাচীন সাহিত্য, পৃ-৩৪.

Scanned by CamScanner

## কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার

**শূদ্রক**—নাট্যকার শূদ্রকের আবির্ভাব-কাল বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিতেরা তাঁকে স্থাপন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে শুধু এটুকুই জানা যায় যে তিনি অশ্মকদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্তীকালে শূদ্রক উজ্জয়িনী অধিকার করে সেখানকার রাজা হন। কথাসরিৎসাগরে শূদ্রককে শোভাবতীর রাজারূপে, কাদম্বরীতে বিদিশার রাজারূপে, রাজতরঙ্গিণীতে বিক্রমাদিত্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রাজারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃচ্ছকটিকের চতুর্থ অঙ্কে উল্লিখিত জ্যোতিষশাস্ত্রের তথ্যের উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক Jacobi এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর রচনাকাল কিছুতেই খ্রীঃ চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী হতে পারে না। আলংকারিক বামন শ্লেষের উদাহরণ দিতে গিয়ে শূদ্রকের নাম ("শূদ্রকাদিরচিতেষু প্রবন্ধেষু অস্য ভুয়ান্ প্রপঞ্চো দৃশ্যতে") উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষোক্তির দৃষ্টান্তরূপে মৃচ্ছকটিকের দ্বিতীয়াঙ্ক থেকে দ্যূতকর দর্দুরকের উক্তি ("দ্যূতং হি নাম পুরুষস্য অসিংহাসনং রাজ্যম্") উদ্ধৃত করেছেন। বামন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আলংকারিক। সুতরাং শূদ্রক তাঁর পূর্ববর্তী। ম্যাক্‌ডোনেল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীকেই শূদ্রকের কাল বলে নির্দেশ করেছেন।[১]

মৃচ্ছকটিক শূদ্রক বিরচিত দশ অঙ্কের প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য। ব্রাহ্মণ চারুদত্ত এবং গণিকা বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনী এই প্রকরণের প্রধান উপজীব্য বিষয়। বিত্তশালী চারুদত্ত ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে হীনবিত্ত হয়ে পড়েছেন। এই চারুদত্তের গুণাবলীতে বসন্তসেনা তাঁর প্রতি অনুরক্তা। রাজা পালকের শ্যালক শকারও বসন্তসেনার প্রণয়প্রার্থী। কিন্তু বসন্তসেনা শকারকে আমল দেন না। একদিন শকার বসন্তসেনার পশ্চাদ্ধাবন করলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করেন এবং নিজের অলংকারগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখেন। শর্বিলক নামক এক ব্রাহ্মণ বসন্তসেনার পরিচারিকা রদনিকার প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়ে তার পাণিগ্রহণের জন্য চারুদত্তের গৃহ থেকে ঐ স্বর্ণালঙ্কার অপরহণ করে। চারুদত্ত নিজ পত্নীর গলার হার বসন্তসেনার কাছে প্রেরণ করেন। রদনিকার কথানুসারে শর্বিলক অপহৃত অলংকারগুলি বসন্তসেনাকে দেয়। এদিকে চারুদত্ত-প্রেরিত হারটি পেয়ে বসন্তসেনা তুমুল দুর্যোগের মধ্যে একদিন চারুদত্তের গৃহে উপস্থিত হলেন। উদ্‌ঘাটিত হল হার প্রেরণের রহস্য। বসন্তসেনা সেই রাত্রিতে চারুদত্তের গৃহেই অবস্থান করেন। পরদিন প্রত্যূষে বসন্তসেনাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী প্রস্তুত হলে চারুদত্তের পুত্র রোহসেন সোনার গাড়ী না পেয়ে তার মৃন্ময় শকটের জন্য কাঁদতে থাকে। বসন্তসেনা স্বর্ণশকট নির্মাণের জন্য নিজের সমস্ত অলংকার দান করেন। ভ্রমবশতঃ তিনি শকারের গাড়ীতে আরোহণ করেন।

---

১. Sanskrit Literature, P–316

Scanned by CamScanner

উদ্যানে শকার নিজের গাড়ীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি বসন্তসেনাকে সেই গাড়ী থেকে অবতরণ করতে দেখে তাঁকে বশে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বসন্তসেনার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে অপমানিত শকার কণ্ঠরোধ করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন। সংজ্ঞাহীন বসন্তসেনাকে মৃতা ভেবে শকার তাঁকে উদ্যানে ফেলে পালিয়ে যান এবং চারুদত্তকে বসন্তসেনার মৃত্যুর অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় চারুদত্তের মৃত্যুদণ্ড হয়। চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে উপস্থিত করা হয়েছে, এমন সময় এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে বসন্তসেনাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। চারুদত্তের প্রতি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। পালককে সিংহাসনচ্যুত করে আর্যক রাজপদে নিজেকে অভিষিক্ত করেন। চারুদত্ত এক সময় এই আর্যককে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আর্যক চারুদত্তকে বেণানদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ রাজ্য দান করলেন। রাজাদেশে বসন্তসেনা বধূ আখ্যা লাভ করে চারুদত্তের সহধর্মচারিণী হলেন।

'মৃচ্ছকটিক' সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। রাজা ও রাজসভার চিরাচরিত গণ্ডীকে অতিক্রম করে সমাজের সর্বস্তরের বিভিন্ন চরিত্রকে উপস্থাপিত করে শূদ্রক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। দরিদ্র চারুদত্ত এই প্রকরণের নায়ক, নায়িকা বারবণিতা বসন্তসেনা। সংবাহক, শর্বিলক, মাথুর, দর্দুরক, রদনিকা, মদনিকা প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সমাজের নীচুতলার মানুষ। এদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই তৎকালীন বৃহত্তর সমাজের বাস্তব চিত্রটি ফুটে উঠেছে। নাট্যকারের প্রতিভাস্পর্শে নিন্দিত চরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে নন্দিত। চারুদত্তের মহানুভবতা ও অকৃত্রিম প্রেম বসন্তসেনাকে বারবধূ থেকে গৃহবধূতে উন্নীত করেছে। নায়ক-নায়িকার প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাজনৈতিক ঘটনার এমন সংমিশ্রণ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে দুর্লভ। জনগণই যে রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রক তা রাজা পালককে সিংহাসনচ্যুত করে জনপ্রতিনিধি রূপে আর্যকের রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনায় স্পষ্ট। কাহিনীবিন্যাসের ন্যায় চরিত্রচিত্রণেও নাট্যকারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। চারুদত্ত দরিদ্র হয়েও দানশৌণ্ড, নির্ধন হয়েও মানধন, মহানুভবতার পারাবার হয়েও নিস্তরঙ্গ। বসন্তসেনা বারবণিতা হয়েও পূতচরিতা ও গুণগ্রাহিণী। তাঁর প্রেমৈকনিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য। চারুদত্তের পত্নী ধুতাদেবীর পতিপ্রাণতা, আভিজাত্য ও স্বার্থত্যাগ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। বিদূষক মৈত্রেয়ের সারল্য ও বন্ধুবাৎসল্যের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবহমান করুণ রসের প্রবাহ সহজেই অনুমেয়। অন্যান্য গৌণ চরিত্রগুলিও যেন বাস্তবোচিত এবং স্ব-স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। কল্পনার বাইরেও জীবনের যে একটি বাস্তব দিক আছে, বৈচিত্র্যই যে মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য, এই পরম সত্যের প্রতি শূদ্রকই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাই Wilson মৃচ্ছকটিককে অন্যান্য সংস্কৃত নাটক অপেক্ষা অনেক বেশী মানবিক গুণে সমৃদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন—"The Mṛcchakatika is in many respects the most human of all the Sanskrit

Scanned by CamScanner

plays." কোন কোন সমালোচকের মতে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক হল—"most Shakespearian of all Sanskrit plays."

## শ্রীহর্ষের নাটকত্রয়

ভারতবর্ষে তিনজন প্রসিদ্ধ হর্ষের কথা জানা যায়—একজন নাট্যকার শ্রীহর্ষ, অপরজন 'নৈষধচরিত' এর রচয়িতা শ্রীহর্ষ, অন্যজন কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ। 'নৈষধচরিত'-প্রণেতা শ্রীহর্ষ দ্বাদশ শতকের কবি। তিনি তাঁর এই মহাকাব্যের বিভিন্ন সর্গান্ত শ্লোকে তাঁর অন্যান্য রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে কোন নাট্যকৃতির উল্লেখ নেই। তৃতীয় জন্য ১১১৩ খ্রী থেকে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে কাশ্মীরের রাজপদ অলংকৃত করেছিলেন। এই শ্রীহর্ষের সাহিত্যকীর্তির কথা অজ্ঞাত। প্রথমোক্ত শ্রীহর্ষ পুষ্যভূতি বংশোদ্ভব থানেশ্বররাজ। ইনি গদ্যকাব্য-রচয়িতা বাণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' এই শ্রীহর্ষেরই জীবনেতিহাস ও কীর্তিকাহিনীর চিত্রময় কথারূপ। ৬০৬ খ্রীঃ থেকে ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীহর্ষদেব সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। এই রাজাধিরাজ শ্রীহর্ষই যে প্রখ্যাত নাট্যকার এবং রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দের রচয়িতা একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

নবম শতাব্দীর নাট্যকার দামোদরগুপ্ত তাঁর 'কুট্টনীমতম্' নাটকে শ্রীহর্ষের রত্নাবলীর উল্লেখ করেছেন। ইৎ সিং নাগানন্দের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীহর্ষরচিত নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। ইৎ-সিং সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে ছিলেন। সুতরাং নাট্যকার শ্রীহর্ষ এঁদের পূর্ববর্তী। এই পূর্ববর্তিত্ব রাজা শ্রীহর্ষকেই সূচিত করে। তবুও 'রত্নাবলী' নাটিকার রচয়িতা সম্পর্কে নানা সংশয় আছে। কাব্যপ্রকাশের "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্" (১.২) এই উক্তিকে টীকাকার মহেশ্বর এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন কবিনা রত্নাবলীং নাম নাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা ততো ধনং লব্ধম্।" অর্থাৎ কবি ধাবক স্বরচিত রত্নাবলী নাটিকা রাজা শ্রীহর্ষের নামে লিখে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে অর্থলাভ করেছিলেন। কিন্তু ধাবকের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। কাব্যপ্রকাশের কোন কোন সংস্করণে ধাবকের স্থলে 'বাণ' এর উল্লেখ আছে। কিন্তু বাণের রচনারীতির সঙ্গে রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা বা নাগানন্দ নাটকের রচনারীতির দুস্তর ব্যবধান। কাজেই খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের পুষ্যভূতি বংশোদ্ভব সার্বভৌম রাজা শ্রীহর্ষই এই নাটকত্রয়ের রচয়িতা। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের জগতকে শ্রীহর্ষ তিনটি নাট্যকৃতি উপহার দিয়েছেন—রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা এবং নাগানন্দ।

রত্নাবলী চার অঙ্কের নাটিকা জাতীয় উপরূপক। সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলী এবং বৎসরাজ উদয়নের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত। সমুদ্রে প্রবহণ বিপর্যয়ে বিপন্না সিংহলরাজদুহিতা রত্নাবলীকে উদ্ধার করে কৌশাম্বীর এক বণিক অর্পণ করলেন যৌগন্ধরায়ণের কাছে। যৌগন্ধরায়ণ সাগরিকা নাম দিয়ে তাকে গচ্ছিত রাখলেন বৎসরাজমহিষী বাসবদত্তার কাছে। বসন্তোৎসবে মদনকান্তি উদয়নকে দেখে সাগরিকার

Scanned by CamScanner

চিত্ত প্রেমে উদ্বেল হল। উদয়নও চিত্রফলকে অঙ্কিত সাগরিকারে দেখে মুগ্ধ হলেন। উভয়ের প্রণয়ের কথা জেনে ক্ষুব্ধা বাসবদত্তা অন্তঃপুরে সাগরিকাকে অন্তরীণ করে রাখলেন। অবশেষে সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর মন্ত্রী বসুভূতির আগমনে সাগরিকার যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল। এভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বাসবদত্তার আনুকূল্যে নায়ক-নায়িকার মিলনে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রিয়দর্শিকা চার অঙ্কের নাটিকা। অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকার সঙ্গে রৎসরাজ উদয়নের মিলন কাহিনী এই নাটিকার প্রধান উপজীব্য বিষয়। অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মা উদয়নের সঙ্গে কন্যার বিবাহের মনস্থ করে তাকে উদয়নের কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। ইত্যবসরে তিনি কলিঙ্গরাজের হাতে পরাজিত হয়ে বন্দী হন। উদয়নের সেনাপতির সহায়তায় প্রিয়দর্শিকা উদয়নেরই অন্তঃপুরে স্থান লাভ করেন। তাঁর নাম হয় আরণ্যকা। উদয়ন ও আরণ্যকার পারস্পরিক প্রণয়ের কথা জেনে ক্রুদ্ধা রাজমহিষী বাসবদত্তা আরণ্যকাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অবশেষে আরণ্যকার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। আরণ্যকা বাসবদত্তারই মাতুলকন্যা। উদয়ন ও আরণ্যকার মিলনে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে এবং আখ্যানভাগের পরিণতির দিক দিয়ে রত্নাবলী নাটিকার সঙ্গে প্রিয়দর্শিকার সাদৃশ্য আছে। তবে বাসবদত্তা এখানে পদে পদে মানবতী নায়িকা, অনেক বেশী স্বার্থপরায়ণা।

নাগানন্দ ভিন্ন স্বাদের পাঁচ অঙ্কের নাটক। বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র জীমূতবাহনের আত্মদানের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। মলয়পর্বতে জীমূতবাহন অনিন্দ্যসুন্দরী মলয়বতীকে দেখলেন। উভয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হল প্রণয়। প্রণয় বর্ষবসিত হল পরিণয়ে। একদিন সমুদ্রের বেলাভূমিতে শ্যালক মিত্রাবসুর সঙ্গে ভ্রমণকালে জীমূতবাহন এক করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনলেন, অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে পক্ষীরাজ গরুড়ের খাদ্যরূপে পুত্র শঙ্খচূড়কে আজ বধ্যশিলায় প্রেরণ করতে হবে। এ ক্রন্দনধ্বনি শঙ্খচূড়ের মাতার মাতৃহৃদয়েরই মর্মভেদী হাহাকার। পরহিতব্রতী জীমূতবাহন শঙ্খচূড়ের জীবন রক্ষার জন্য নিজেই বধ্যশিলায় উপবেশন করলেন। গরুড় তাঁকে ভক্ষণ করছে অথচ ভক্ষ্য নির্বিকার। নিজের ভুল বুঝতে পেরে গরুড় অনুতপ্ত হল। অবশেষে জীমূতবাহনের প্রার্থনায় গরুড়ের সর্পভক্ষণ বন্ধ হল, অমৃতসিঞ্চনে নিহত নাগকুল পুনর্জীবিত হল।

"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ।" শুধু কবি হিসাবে নয়, নাট্যকার হিসাবেও শ্রীহর্ষ নিপুণ। তিনটি নাটকেরই কাহিনীর উৎস সম্ভবতঃ গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'। তবে প্রতিটি নাটকের কাহিনী-বিন্যাসে নাট্যকারের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় স্পষ্ট। 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা'-তে শৃঙ্গাররস এবং 'নাগানন্দে' বীররসকে অঙ্গীরসরূপে উপস্থাপিত করে রস-পরিবেশনেও শ্রীহর্ষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যকারের কল্পনাপ্রভাবেই মগধরাজকন্যা পদ্মাবতী সিংহলরাজদুহিতা রত্নাবলীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। ঐন্দ্রজালিকের যাদুবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্ট আগুনকে নাট্যকার নায়ক-নায়িকার মিলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজে

Scanned by CamScanner

লাগিয়েছেন। মানবতী বাসবত্তার স্বার্থচিন্তা এবং বসন্তোৎসবের পরিকল্পনা রত্নাবলীর হৃদয়ে প্রেমোন্মেষের সহায়ক হয়ে উঠেছে। নাগানন্দে প্রেম ও করুণার আদর্শ শেষপর্যন্ত দয়াবীরে পর্যবসিত হয়েছে। মহাপ্রাণ জীমূতবাহনের আত্মদান মর্ত্যলোকে বহন করে এনেছে অমৃতের বাণী। চরিত্রচিত্রণেও শ্রীহর্ষের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। সব ক'টি নাট্যকৃতিতে পূর্বসূরীদের কাছে বিশেষতঃ ভাসের কাছে তাঁর ঋণ স্পষ্ট হলেও প্রণয়মধুর পরিবেশ সৃষ্টিতে কবির স্বকীয়তা প্রশংসার দাবী রাখে। পরবর্তী নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন নাট্যকলার উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন। 'রত্নাবলী' যে নাট্যকার শ্রীহর্ষের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। সাহিত্যরসিক ডঃ এস. কে. দে তাই মন্তব্য করেছেন—"The Sanskrit dramaturgists quote the Ratnāvali, which is undoubtedly Harsa's masterpiece, as the standard of well-knit play.[১]"

## ভবভূতির নাটকাবলী

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কালিদাসের পরেই যাঁর নাট্যকৃতি পরম শ্রদ্ধায় সমাদৃত হয়, তিনি হলেন নাট্যকার ভবভূতি। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটক যেমন কালিদাসের সর্বস্ব, তেমনি 'উত্তররামচরিত' নাটকও ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি। তাই বলা হয়—"উত্তরে রামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে।" ভবভূতির রচনা থেকে তাঁর কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বিদর্ভের পদ্মপুরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর বংশের উপাধি ছিল উদুম্বর। তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ এবং পিতামহের নাম ভট্টগোপাল। তাঁর মাতার নাম ছিল জাতুকর্ণী। ভবভূতির প্রকৃত নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ, কিন্তু শিবের উপাসক বলে তিনি ভবভূতি আখ্যা লাভ করেন। রাজশেখর 'বালরামায়ণে' (১.১৬) ভবভূতিকে বাল্মীকির অবতার বলে উল্লেখ করেছেন। বামনের 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি'-তে ভবভূতির রচনাংশ উদ্ধৃত হয়েছে[২]। কল্‌হণের মতে কনৌজরাজ যশোবর্মন ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষক এবং ভবভূতি ও বাক্‌পতি তাঁর সভাকবি ছিলেন[৩]। ঐতিহাসিকদের মতে ৬৯৫ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যশোবর্মার রাজত্বকাল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগ বা অষ্টম শতকের প্রথম ভাগই ভবভূতির স্থিতিকাল।

**মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত**—এই তিনটি নাটক ভবভূতির নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন। 'মালতীমাধব' কবির প্রথম রচনা। এটি দশ অঙ্কের প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য। বিদর্ভের রাজমন্ত্রী দেবরাতের পুত্র মাধব এবং উজ্জয়িনীর রাজমন্ত্রী

১. Dasgupta & De : HSL, P–261

২. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি, ১.২.১২ এবং ৪.৩.৬।

৩. কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্মাতদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্‌।।—রাজতরঙ্গিণী, ৪.১৪৪

Scanned by CamScanner

ভূরিবসুর কন্যা মালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। মদন উৎসবে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার, তাদের পারস্পরিক অনুরাগ, রাজসুহৃদ নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহের সংবাদ প্রচার, গোপনে নায়ক-নায়িকার শঙ্করের মন্দিরে গমন, হতাশ মাধবের শ্মশানে উপস্থিতি, কাপালিক অঘোরঘণ্টের আদেশে কালীমন্দিরে মালতীকে বলিদানের উদ্যোগ, মাধব কর্তৃক কাপালিকের প্রাণনাশ এবং মালতীর উদ্ধার, বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকীর সহায়তায় মালতী ও মাধবের মিলন—প্রভৃতি ঘটনার জটিলতাকে কবি নিপুণভাবে বিন্যস্ত করেছেন। নায়ক-নায়িকার প্রণয়কাহিনীর পাশাপাশি এখানে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার প্রেমকাহিনীও চিত্রিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, বিরহ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মনোধর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নাটকটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মালতীকে হারিয়ে মাধবের উন্মত্ততায় ও বেদনার্তিতে উন্মত্তপ্রায় পুরূরবার প্রচ্ছায়া পরিলক্ষিত হয়। সেই করুণরসের বর্ণনায় ভবভূতির প্রসিদ্ধি প্রবাদে পর্যবসিত। শ্মশানের ভীষণতা বর্ণনাতেও নাট্যকারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। তবুও ভবভূতির এই প্রথম নাট্যকৃতি সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত নয়। নবম ও দশম অঙ্কের ঘটনাবলী কষ্টকল্পিত। মকরন্দ-মদয়ন্তিকার প্রণয়কাহিনীর পাশে নাটকের মূল কাহিনী ও নায়ক-নায়িকার প্রণয় নিতান্তই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সংযম ও সঙ্গতির অভাব এই নাটকে বিরক্তির উদ্রেক করে। পরবর্তী নাটক দুটিতে ভবভূতি তাঁর এই ত্রুটিকে অতিক্রম করে নাট্যপ্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারাপথে কুশলী নাট্যকারের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

মহাবীরচরিত ভবভূতির দ্বিতীয় নাট্যকৃতি। নাটকটি সাত অঙ্কে রচিত। সীতার বিবাহ থেকে আরম্ভ করে রাবণবধের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং অভিষেক পর্যন্ত ঘটনার চিত্ররূপ এই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকের প্রয়োজনে বাল্মীকি-বর্ণিত রামায়ণের কাহিনীকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করে নাট্যকার দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতা ও উর্মিলাকে দর্শন, সীতার পাণিপ্রার্থী হয়ে রাবণ কর্তৃক জনকের কাছে দূত প্রেরণ, দূতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, প্রতিহিংসাপরায়ণ রাবণের দ্বারা পরশুরামকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা, শূর্পনখার মন্থরারূপ গ্রহণ ও কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দিয়ে রামের বনবাসের ব্যবস্থা প্রভৃতি অবাল্মীকীয় কাহিনী এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। রামায়ণের বালিবধজনিত রামচন্দ্রের যে কলঙ্ক, তা ঘটনার বিবর্তনে এখানে অপনোদিত হয়েছে। পুষ্পক বিমানে রামসীতার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে পূর্বস্মৃতি-বিজড়িত জনস্থান ও দণ্ডকারণ্যের যে আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে তা কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয়। বীররসপ্রধান এই নাটকে অন্যান্য অঙ্গরসের উপস্থাপনাও প্রয়োজনানুগ। কাহিনীর সংঘাত-সমাবেশে নাট্যকারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। রামায়ণের সর্বগুণাধার রামচন্দ্র সজ্জনদের পরিত্রাণের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন—

ইদং হি তত্ত্বং পরমার্থভাজাময়ং হি সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্রিধা বিভক্তা প্রকৃতিঃ কিলৈষা ত্রাতুং ভুবি স্বেন স্বতোঽবতীর্ণা।। (৭.২)

Scanned by CamScanner

রাবণের কুটিল চক্রান্তের পাশে রামচন্দ্রের বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্র অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি ক্ষমার পারাবার, মূর্তিমান পুণ্যফল—

"ক্ষমায়াঃ স ক্ষেত্রং গুণমণিগণানামপি খনিঃ
প্রপন্নানাং মূর্তঃ সুকৃতপরিপাকো জনিমতাম্।" (৭.৩৩)

স্বাভাবিক বীরত্বে, ব্রাহ্মণোচিত তেজ ও তপোবলে, ক্ষাত্রজনোচিত শৌর্য ও দম্ভে এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠায় পরশুরাম চরিত্র অনন্য। বীরত্ব ও ভ্রাতৃপ্রেমের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম ঘটেছে লক্ষ্মণের চরিত্রে। পূতচরিতা সীতার মুগ্ধতা এই নাটকে তাঁকে স্বীয়া নায়িকার মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

অলংকৃত রচনারীতি, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ও সংলাপের ব্যবহার, পাণ্ডিত্য প্রকাশের দাম্ভিকতা প্রভৃতির জন্য ভবভূতির এই নাট্যকৃতি জনসমাজে ততখানি সমাদৃত হয়নি। বিষয়বস্তু ভালো হলেই নাটক ভালো হয় না, নাটকের উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন সার্থক উপস্থাপনা—".....a good theme by itself does not make a good drama, but it should have a good presentation." আর এই জায়গাতেই ভবভূতি অসফল।

"উত্তররামচরিত' ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঘটনা অবলম্বনে রচিত এই নাটকের সাতটি অঙ্কে ভবভূতির কাব্যশিল্প সর্বোচ্চ মহিমায় উন্নীত হয়েছে। প্রথমাঙ্কে চিত্রদর্শনকালে বনভূমিতে যাওয়ার জন্য সীতা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সীতার মনোবাসনা পূরণের জন্য সীতাপতির আদেশে রথ প্রস্তুত হল। গর্ভভারমন্থরা সীতা চিত্রদর্শনকালে ভাববিহ্বল হয়ে ক্লান্তিতে রামচন্দ্রের বুকে মাথা রেখে নিদ্রাভিভূতা হলেন। ইত্যবসরে গুপ্তচর দুর্মুখের মুখে সীতার সম্পর্কে লোকাপবাদ শুনে বেদনাক্লিষ্ট রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য অপাপবিদ্ধা সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী ও বাসন্তীর সংলাপ থেকে জানা যায় যে, স্বর্ণসীতা পাশে রেখে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। শম্বূকবধের পর রামচন্দ্র পঞ্চবটীর পূর্বস্মৃতি-জড়িত স্থানগুলি দর্শন করে সীতার জন্য বিলাপ করতে করতে ঘন ঘন মূর্ছিত হচ্ছেন। এই দৃশ্যে ভাগীরথীর বরে অদৃশ্যরূপিণী সীতা উপস্থিত থেকে রামচন্দ্রের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করছেন। রামচন্দ্র ছায়ারূপিণী সীতার সুখস্পর্শ লাভ করলেও তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে পারছেন না। চতুর্থ অঙ্কে জনক ও কৌশল্যা বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। বাল্মীকির আশ্রমে পরিবর্দ্ধিত লব রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রিত হয়েছে যজ্ঞীয়াশ্ব-রক্ষক চন্দ্রকেতুর সঙ্গে লবের যুদ্ধ। রামচন্দ্রের উপস্থিতিতে উভয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। লব ও কুশের অসাধারণ রূপে মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র অমিতবিক্রম বালকদ্বয়ের প্রশংসা করলেন। সপ্তমাঙ্কে ঘটনার বিবর্তনে রাম, সীতা ও লবকুশের মিলনে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

"উত্তররামচরিত' করুণরসের নাটক। বাল্মীকির বিয়োগান্ত কাহিনী ভবভূতির প্রতিভাস্পর্শে এখানে মিলনাত্মক পরিণতি লাভ করেছে। নাটকটির প্রথম থেকে করুণরসের যে মূর্ছনা অনুরণিত হচ্ছিল তা চরম রূপ লাভ করেছে তৃতীয়াঙ্কের ছায়াদৃশ্যে। এখানে সীতার কথা স্মরণ করে রামচন্দ্র যেমন ব্যাকুল ক্রন্দন করেছেন, তেমনি ছায়ারূপিণী সীতাও প্রিয়তমের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করে অশ্রুসংবরণ করতে পারেন নি। রামচন্দ্রের হৃদয়াবেগ ও প্রেমৈকনিষ্ঠা দেখে সীতার চোখেও নেমেছে বাঁধভাঙা অশ্রুর প্লাবন। করুণ রসের এই মিলিত উৎসারে পাষাণও কেঁদে উঠে, বজ্রও বিগলিত হয়—"অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্" (১.২৮)। নায়ক-নায়িকার প্রেমার্তির করুণ প্রবাহ এখানে প্রত্যেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সম্ভবতঃ উত্তররামচরিতের এই করুণতম অংশটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই উক্তির প্রচলন হয়েছে—'কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে।" করুণ রসেই যে সমস্ত রসের পর্যবসান ভবভূতির এই গভীর প্রত্যয় প্রতিফলিত হয়েছে রামচন্দ্রের এই উক্তিতে—

"একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।" (৩.৪৭)

এই নাটকের প্রকৃতি বর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী। কালিদাসের প্রকৃতিচিত্রণের চারুত্ব হয়তো এখানে অনুপস্থিত, কিন্তু প্রকৃতির বাস্তব রূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে ভবভূতি নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ শিল্পী। দাম্পত্য প্রেম সম্পর্কেও কবির ধারণা ছিল অনন্যসুলভ। তাঁর মতে দাম্পত্যপ্রেম এমন এক অদ্বিতীয় সম্পদ যা সুখ-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় একই অবস্থায় থাকে, যা হৃদয়ের বিশ্রান্তিস্থল, জরা তাকে হরণ করতে পারে না, বহু সাধ্যসাধনায় লব্ধ সেই পবিত্র প্রেম কালক্রমে স্নেহসারে পরিণত হয়। তাই অলৌকিক প্রেমের মর্যাদায় উন্নীত রামসীতার সুমধুর দাম্পত্য প্রেম সম্পর্কে ভবভূতি বলেছেন—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগতং সর্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।।" (১.৩৯)

চরিত্রচিত্রণেও ভবভূতির গৌরব কম নয়। ধর্মবীর রামচন্দ্র বহু বেদনার মধ্যেও আত্মসংবৃত। তাঁর কুসুমকোমল হৃদয় কর্তব্য সাধনে বজ্র অপেক্ষাও কঠোর। প্রিয়তমাকে বিসর্জনের শোকাবেগ তাঁকে বিরহবিধুর প্রেমিক সত্তার এক করুণাঘন মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে। সীতার চরিত্রমাধুর্য্য অতুলনীয়। লবের বীরত্ব ও শালীনতা হৃদয়গ্রাহী। আরণ্য পরিবেশে বাসন্তী ও আত্রেয়ী যেন মূর্তিমতী বনদেবী। চন্দ্রকেতুর বীরত্ব যেন দুর্ললিত যৌবনের পূর্বাভাস।

নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে ভবভূতি বাল্মীকির বিয়োগান্তক কাহিনীকে মিলনপর্যবসায়ী করে তুলেছেন। এতে নাট্যকারের নাট্যকৌশল প্রয়োগের

Scanned by CamScanner

দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। ডঃ সুশীলকুমার দে তাই যথার্থই বলেছেন—'It requires a considerable mastery of dramatic art to convert it from a real tragedy into a real comedy of happiness and reunion."[১] ভবভূতির নাটকে বিদূষকের ভূমিকা অনুপস্থিত বলেই হাস্যরসের অবতারণার কোন অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ নিজে ব্রাহ্মণ বলেই ব্রাহ্মণ বিদূষককে হাসির খোরাকরূপে নাট্যকার মঞ্চে উপস্থাপিত করেন নি। আর সেই কারণেই তাঁর তিনটি নাটকই বিদূষক-বর্জিত। নাট্যকলার সঙ্গে কাব্যকলার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে ভবভূতির নাটকে। কাহিনীবিন্যাসের দক্ষতায়, চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে, করুণ রস পরিবেশনের অনন্যসুলভ পটুত্বে, প্রকৃতির বাস্তব রূপচিত্রণের মাধুর্য্যে, প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সহমর্মিতা বর্ণনার অনায়াস চারুত্বে, ভাব ও ভাষার হৃদয়গ্রাহিতায় ভবভূতির নাট্যপ্রতিভা উত্তররামচরিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাই যথার্থই বলা হয়ে থাকে—"উত্তরে রামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে।"

## ভট্টনারায়ণ

ভট্টনারায়ণ রচিত 'বেণীসংহার' সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বঙ্গাধিপতি আদিশূরের আমন্ত্রণে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন, ভট্টনারায়ণ তাঁদের অন্যতম। কিন্তু এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিক সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধ নয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার আদিশূরের অস্তিত্বকে অস্বীকার না করলেও কুলজী গ্রন্থসমূহের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বামন এবং আনন্দবর্ধন বেণীসংহারের উল্লেখ করেছেন। বামনের কাল ৭৫০-৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই ভট্টনারায়ণ অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। M. Krishnamachariar এর অভিমত এই যে, বাণভট্টের অনুরোধে ভট্টনারায়ণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং ধর্মকীর্তিকে পরাজিত করেন।[২] এই দিক থেকে বিচার করলে ভট্টনারায়ণকে সপ্তম শতকের নাট্যকাররূপে চিহ্নিত করা যায়। আদিশূরের কাল নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। ৭২৬ খ্রীঃ থেকে ৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়কে পণ্ডিতেরা আদিশূরের কালরূপে চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগকে ভট্টনারায়ণের আবির্ভাব কাল বলে চিহ্নিত করাই নিরাপদ।

ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার ছয় অঙ্কের বীররসপ্রধান নাটক। মহাভারতের উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং শল্যপর্ব থেকে কাহিনী আহরণ করে নাটকটি রচিত। ভীমকর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে সেই রক্তরঞ্জিত হাতে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ভানুমতী দ্রৌপদীকে বিদ্রূপ করেছেন

১. HSL, P–294

২. HSL, P–62

Scanned by CamScanner

শুনে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করলেন। কৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করলেন। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুসংবাদে শোকবিহ্বল অশ্বত্থামা অস্ত্রত্যাগ করেও পরে কৃপাচার্যের নির্দেশে অস্ত্রগ্রহণ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ প্রভৃতি মহারথীদের মৃত্যুতে বিচলিত দুর্যোধন আত্মগোপন করলেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে সংবাদ এল যে গদাযুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের মৃত্যু হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। শোকাকুল যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অগ্নিতে আত্মত্যাগে উদ্যত, এমন সময় ভীমসেন দুর্যোধনের রক্তরঞ্জিত হাতে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধনের জন্য উপস্থিত হলেন।

কাহিনীর উৎস মহাভারত হলেও নাট্যকার এই নাটকে উৎসভূত বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করেছেন, প্রয়োজনে কল্পিত কাহিনীর সংযোজন করেছেন। তৃতীয়াঙ্কে অশ্বত্থামা ও কর্ণের বিতর্ক, পঞ্চমাঙ্কে দুর্যোধনের অন্বেষণে গুপ্তচর পাঞ্চালকের নিয়োগ, চার্বাক ও ধর্মের মধ্যে সংলাপ, গদাযুদ্ধে ভীমার্জুনের মৃত্যুসংবাদ প্রভৃতি কাহিনী অমহাভারতীয় হলেও নাট্যকারের নৈপুণ্যে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বীররসের পরিপুষ্টির জন্য রৌদ্র, হাস্য প্রভৃতি অঙ্গরসের প্রয়োগে নাট্যকারের দক্ষতা তর্কাতীত। চরিত্রচিত্রণেও ভট্টনারায়ণ সফল। তবে বর্ণনার অনাবশ্যক বিস্তার এবং দীর্ঘ সংলাপ মাঝে মাঝে নাট্যগতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। অধিকাংশ নাট্যতত্ত্ববিদ্ নাটকের বিভিন্ন তত্ত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে এই নাটকের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন। এর থেকে নাটকটির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

## বিশাখদত্ত

কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার বিশাখদত্ত সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের জগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তক। তাঁর 'মুদ্রারাক্ষস' সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে একমাত্র রাজনীতিকে অবলম্বন করে রচিত নাটক। গতানুগতিক প্রণয়কাহিনী এখানে অনুপস্থিত। এখানে স্ত্রীভূমিকাও নেই বললেই চলে। কাজেই বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' চিরাচরিত মার্গব্যতিরেকী নাটক।

নাটকের প্রস্তাবনা[১] থেকে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম ভাস্কর দত্ত এবং পিতামহ বটেশ্বর দত্ত। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তাঁকে মহারাজ পৃথুর পুত্র এবং সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের মতে মৌখরীরাজ অবন্তিবর্মার[২] সময়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগই কবির স্থিতিকাল। কিন্তু বিভিন্ন পুঁথিতে অবন্তিবর্মার স্থলে পাঠান্তর আছে দন্তিবর্মা, কোথাও বা রন্তিবর্মা। পল্লব রাজবংশের দন্তিবর্মার রাজত্বকাল ৭৭৯ থেকে ৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত[৩]। অবন্তিবর্মা নামে জনৈক কাশ্মীররাজের কথা

১. ".....সামন্তবটেশ্বরদত্তপৌত্রস্য মহারাজপদভাক্ পৃথুসূনোঃ কবের্বিশাখদত্তস্য.....।"

২. মুদ্রারাক্ষসের অন্তিম শ্লোকে রাজা অবন্তিবর্মার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

৩. C. J. Dubrauil : Ancient History of the Deccan, P–74

Scanned by CamScanner

'জানা যায় যিনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেছিলেন। নাটকে বর্ণিত ভৌগোলিক তথ্য, কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি, বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রভৃতির দিক থেকে বিচার করে কৃষ্ণমাচারিয়ার খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীকে এই নাটকের রচনাকাল বলে স্থির করেছেন[১]। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত বিশাখদত্তকে খ্রীঃ নবম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে অভিমত পোষণ করেছেন।

'মুদ্রারাক্ষস' রাজনীতির জটিলতাকে অবলম্বন করে রচিত সপ্তাঙ্ক নাটক। নন্দবংশের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে কূটনীতিধুরন্ধর চাণক্য বশীভূত করে চন্দ্রগুপ্তের প্রয়োজনে লাগাতে চান। রাক্ষস তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে প্রিয়বন্ধু বণিক চন্দনদাসের গৃহে রেখেছিলেন। স্বনিযুক্ত গুপ্তচরের মাধ্যমে চাণক্য এই বৃত্তান্ত জানতে পারেন। চন্দনদাসের গৃহদ্বারে প্রাপ্ত রাক্ষসের নামাঙ্কিত আংটি গুপ্তচরের মাধ্যমে চাণক্যের হস্তগত হয়। চাণক্য সেই আংটি কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। কৌমুদী মহোৎসবকে কেন্দ্র করে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে কৃত্রিম বিরোধের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ চাণক্য-সৃষ্ট এ বিরোধ শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার কৌশলমাত্র। এই বিরোধকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক মনে করে অমাত্য রাক্ষস মলয়কেতুকে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন। ইত্যবসরে চাণক্যের রাজনৈতিক চালে রাক্ষসের নামমুদ্রাঙ্কিত দলিল মলয়কেতুর হাতে পড়ে। রাক্ষসকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে মলয়কেতু তাকে পরিত্যাগ করেন। চন্দনদাসকে শূলে চড়ানো হবে—চাণক্য-প্রচারিত এই ঘোষণা শুনে বন্ধুবৎসল রাক্ষস আত্মসমর্পণ করেন। চাণক্য সেই রাজনীতি বিশারদ রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। রাক্ষসকে বশে আনার ক্ষেত্রে রাক্ষসের নামমুদ্রাঙ্কিত আংটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মুদ্রার দ্বারা রাক্ষসকে বশীভূত করা হয়েছে বলে নাটকটির নামকরণ হয়েছে 'মুদ্রারাক্ষস'।

চাণক্য এবং রাক্ষস—এই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রদ্বয়ের রাজনৈতিক কূটকৌশল প্রয়োগের প্রতিযোগিতা ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রাক্ষস-প্রযুক্ত প্রতিটি নীতিই কুশাগ্রধী চাণক্যের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, অমাত্য রাক্ষস শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। যেমন সাপুড়ের ছদ্মবেশে কুসুমপুরে বিরাধগুপ্তকে প্রেরণ, চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের জন্য নগরতোরণ নির্মাণ, বিষপ্রয়োগের জন্য বৈদ্য অভয়দত্তের নিয়োগ, বিষকন্যা প্রেরণ প্রভৃতি রাক্ষসের প্রচেষ্টা চাণক্যের দূরদর্শিতায় কেবল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি, রাক্ষস-গৃহীত নীতিগুলি তারই সর্বনাশ করেছে। লোকক্ষয়কারী সংগ্রামের পরিবর্তে কেবল সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি নীতিপ্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুজয়ে চাণক্যের প্রচেষ্টা সত্যই অভিনন্দনীয়। এই নাটকে কূটনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ নাট্যকারের নৈপুণ্যে ঘটনাপ্রবাহের জটিলতা সৃষ্টি করে

১. M. Krishnamachariar : HCSL, P–606

Scanned by CamScanner

নি। এই নাটকের গঠন-বৈশিষ্ট্য নাট্যকারের নাট্যভাবনার পরিচায়ক। নাটকীয় ঘটনার ঐক্য এবং সংহতি নাটকটিকে সফল নাটকের মহিমায় মণ্ডিত করেছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ক্রিয়াগত ঐক্যবিধির এমন সার্থক রূপায়ণ দুর্লভ। তাই Wilson মন্তব্য করেছেন—"It may be difficult in the whole range of dramatic literature to find a more successful illustration of the rule."

## কৃষ্ণমিশ্র

নাট্যকার যতি শ্রীকৃষ্ণমিশ্র তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছেন যে, রাজা কীর্তিবর্মার বিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। কীর্তিবর্মার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন রাজা গোপাল। এই গোপাল চেদিরাজ কর্ণকে পরাজিত করে কীর্তিবর্মাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের একটি অনুশাসনে চেদিরাজ কর্ণের উল্লেখ আছে। কীর্তিবর্মার দেওগর অনুশাসন ১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কীর্তিবর্মার রাজত্বকালে কবি বর্তমান ছিলেন ধরে নিলে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধকে কৃষ্ণমিশ্রের স্থিতিকালরূপে চিহ্নিত করা যায়।

'প্রবোধচন্দ্রোদয়' শ্রীকৃষ্ণমিশ্র রচিত রূপকধর্মী (allegorical) ছয় অঙ্কের নাটক। এই নাটকে মানবের চিত্তবৃত্তিসমূহ নাটকীয় পাত্রপাত্রীরূপে কল্পিত হয়েছে। দুটি বংশের পারিবারিক কলহ এই নাটকের বহিরঙ্গ ঘটনা। বংশের প্রধান ব্যক্তি পুরুষকে কেন্দ্র করে তার মুক্তির জন্যই ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। পুরুষের পত্নী মায়া। মন তাদের একমাত্র সন্তান। মনের দুই স্ত্রী—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সন্তান মোহ আর নিবৃত্তির সন্তান বিবেক। মহামোহের পক্ষে আছে কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অহংকার, মিথ্যাদৃষ্টি, রতি, তৃষ্ণা প্রভৃতি। অন্যদিকে বিবেকের পক্ষে আছে মতি, বিষ্ণুভক্তি, ধর্ম, শম, করুণা, শ্রদ্ধা শান্তি, ভক্তি, ক্ষমা প্রভৃতি। মহামোহদের প্রচেষ্টা হল পুরুষকে বদ্ধ করে মনের প্রাধান্যে প্রবৃত্তির সাহায্যে জগতে আধিপত্য বিস্তার করা। বিবেকপক্ষীয়দের প্রচেষ্টা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এমতাবস্থায় একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, বিবেকের সঙ্গে উপনিষদ্‌দেবীর মিলনে প্রবোধচন্দ্রের জন্ম হবে এবং এর ফলে পুরুষের মুক্তি ঘটবে। একদিকে বিবেকপক্ষ এই কিংবদন্তীকে সফল করার জন্য যত্নবান, অপরদিকে মহামোহপক্ষ তাকে ব্যর্থ করার জন্য তৎপর। পরিণামে শুরু হল উভয় পক্ষের সংগ্রাম। বিষ্ণুভক্তির অনুরোধে মনের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য সরস্বতী সচেষ্ট হলেন। মন নিবৃত্তিকে সহধর্মচারিণীরূপে গ্রহণ করল। কালক্রমে বিবেক ও উপনিষদ্‌দেবীর সান্নিধ্যবশতঃ উপনিষদ্‌দেবী আপন্নসত্ত্বা হলেন। নিদিধ্যাসন সংকর্ষণ বিদ্যার মাধ্যমে বিদ্যাকে মনে সংক্রমিত করল, প্রবোধচন্দ্র পুরুষে সমর্পিত হলেন। তখন পরমপুরুষ অনুভব করলেন তাঁর আপন শুদ্ধ-মুক্ত-বুদ্ধ স্বভাব। জন্ম হল প্রবোধচন্দ্রের। পরম প্রাপ্তির আনন্দ ধ্বনিত হল পরম পুরুষের কণ্ঠে—

Scanned by CamScanner

"মোহান্ধকারমবধূয় বিকল্পনিদ্রা-
মুন্মথ্য কোঽপ্যজনি বোধতুষাররশ্মিঃ।
শ্রদ্ধাবিবেকমতিশান্তিযমাদিকেন
বিষ্ণ্বাত্মকং স্ফুরতি বিষ্ণুরহং স এষঃ।।" (৬.৩০)

'প্রবোধচন্দ্রোদয়' দার্শনিক ভাবব্যঞ্জক প্রতীক নাটক। নাট্যকার এই নাটকে অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। মায়াবদ্ধ জীব অহংকারের বশবর্তী হয়ে নিজেকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক মনে করে ত্রিতাপদুঃখ সহ্য করে। মিথ্যাদৃষ্টির দ্বারা প্রতারিত হয়ে জীব মোহের বশবর্তী হয়। সে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে যখন নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি করে তখনই সে মোক্ষলাভ করে। এভাবে তার চিত্তে প্রবোধচন্দ্রের প্রাদুর্ভাব ঘটলে তার জীবননাট্যের উপসংহার হয়, তাকে আর জীবন-মরণ-রূপ সংসারনাট্যে অবতীর্ণ হতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র সফল নাট্যকার। বিমূর্ত ভাবগুলি তাঁর প্রতিভাস্পর্শে এই নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শান্তরসপ্রধান এই নাটকে নাট্যকারের শান্তরস পরিবেশনের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। পাশাপাশি বৌদ্ধভিক্ষু, ক্ষপণক ও কাপালিকের উক্তিতে ও আচার-আচরণে উপস্থাপিত হয়েছে হাস্যরস। এদের মাধ্যমে নাস্তিক্য মতের উপস্থাপনা নাটকটিকে সংঘাতময় ও উপভোগ্য করে তুলেছে। পরবর্তীকালে সংকল্পসূর্যোদয়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি রূপকাত্মক নাটক রচিত হলেও শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র গৌরব চির অম্লান। Macdonell এই নাটকের প্রশংসা করে বলেছেন—"Though an allegorical piece of theologico-philosophical purport, in which practically only abstract notions and symbolical figures act as persons, it is remarkable for dramatic life and vigour." (HSL, P-310)

## চতুর্ভাণী

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে চারটি একাঙ্ক নাটিকা (অর্থাৎ ভাণ) একত্রে প্রকাশিত হয়। এই চারটি ভাণের সমষ্টিকে বলা হয় 'চতুর্ভাণী'। এগুলি হল —(১) উভয়সারিকা, যার রচয়িতা বররুচি, (২) শূদ্রক-রচিত 'পদ্মপ্রাভৃতক', (৩) ঈশ্বরদত্তের 'ধূর্তবিটসংবাদ' এবং (৪) শ্যামিলক প্রণীত 'পাদতাড়িতক'। একটি প্রচলিত শ্লোকে এই চারটি নাটিকাকে কালিদাস-পূর্ব যুগের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্লোকটি হল—

বররুচিরীশ্বরদত্তঃ শ্যামিলকঃ শূদ্রকশ্চ চত্বারঃ
এতে ভাণান্ বভণুঃ কা শক্তিঃ কালিদাসস্য।।

'পদ্মপ্রাভৃতক', এর সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের রচনারীতির সাদৃশ্য আছে। কাজেই 'মৃচ্ছকটিক নাটকের রচয়িতা শূদ্রকই এই ভাণের প্রণেতা—এই ধারণা অমূলক নয়। অনেকে আবার

Scanned by CamScanner

খ্রীঃ দশম শতকের শেষভাগকে এগুলির রচনাকাল বলে মনে করেন[১]। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য নগণ্য হলেও প্রতিটি ভাণ বিষয়বৈচিত্র্যে, হাস্য ও ব্যঙ্গের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। সমাজের বাস্তব রূপের প্রতিচ্ছবি এগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

## অন্যান্য দৃশ্যকাব্য

ভবভূতির পরবর্তী যুগে ভারতীয় নাট্যপ্রতিভার গৌরব ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। এই সময় যে সকল দৃশ্যকাব্য রচিত হয়েছিল সেগুলি নাটক হিসাবে নগণ্য, কোন কোনটি আবার পূর্বসুরীদের অনুকরণ মাত্র। খ্রীঃ দশম শতকে রাজশেখর-রচিত চারটি নাটক পাওয়া যায়—(১) বালরামায়ণ; (২) বালভারত, (৩) বিদ্ধশালভঞ্জিকা এবং (৪) কর্পূরমঞ্জরী। এগুলির মধ্যে 'বালভারত' নাটকটি অসম্পূর্ণ। কর্পূরমঞ্জরী চার অঙ্কে রচিত। রাজা চন্দ্রপালের সঙ্গে জনৈক রাজকুমারীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। যশোবর্মণের 'রামাভ্যুদয়' এবং মায়ুরাজের 'উদাত্তরাঘব' সম্প্রতি লুপ্ত। তবে বিভিন্ন অলংকারগ্রন্থ এবং কোষকাব্যে এই নাটক দুটির উদ্ধৃতি দেখে মনে হয় এককালে এই নাটকদ্বয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এছাড়া ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক', মুরারির 'অনর্ঘরাঘব', বিল্‌হণের 'কর্ণসুন্দরী', দামোদর মিশ্রের 'মহানাটক' বা 'হনুমন্নাটক', জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব', কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', শক্তিভদ্রের 'আশ্চর্যচূড়ামণি', প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ক্ষয়িষ্ণু যুগে রচিত হলেও এগুলি যে সংস্কৃত সাহিত্যের এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

---

১. ".....these Bhānas, as a group should be assigne to a period later than that of Bharata's Nātyasāstra, but much earlier than that of the standard work of Dhananjaya (end of the 10th century)."

–Dasgupta & De; HSL, P–250

Scanned by CamScanner

ড. দেবকুমার দাস  সম্পাদিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে ছাত্র- ছাত্রীদের  কিছু তথ্য দিতে পেরে আমি মাননীয় সম্পাদক ড.দেবকুমার দাস  মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদান্তে

দিলরুবা খন্দকার

সংস্কৃত বিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়।

Scanned by CamScanner